Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-II, January 2025, Page No.29-35
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রাজা রামমোহন রায় ও বাংলা সাহিত্য: পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা

ড. জীবনকৃষ্ণ পাত্র
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজ, আগরতলা, ত্রিপুরা

Abstract

'Bharatpathik' Raja Rammohan Roy was the epitome of Bharatatma in the 19th century. His contribution to the social reform of Bengal and India is written in golden letters on the pages of history. He made a coordination between religion and action, East and West, Past and Present, and progressive and conservative. His role in the nineteenth-century Bengali literature was matchless. He carried out this literary process in many ways, and whether this process has become literary quality in a proper way or not, needs to be judged from the point of view of current literary criticism. Because, he started writing based on Sanskrit, Arabic, Persian, English, and Bengali languages mainly for social reformation. His writing of about thirty books and several classical music (Brahmasangit) enriches Bengali prose language. This essay will address how relevant he was as a literary writer and how much he has contributed to Bengali literature.

Keywords: Bharatatma, social reform, coordination, literary pursuits, prose language.

উনিশ শতকের ভারতাত্মার মূর্ত-প্রতীক ছিলেন 'ভারতপথিক' মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। তিনি ছিলেন বাংলা তথা ভারতবর্ষের অন্যতম সমাজসংস্কারক এবং ধর্ম-কর্ম, প্রাচ্য-প্রতীচ্য, অতীত-বর্তমান ও প্রগতিশীল-রক্ষণশীলদের মধ্যে যোগ্য সমন্বয়সাধক। বাংলা সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রবন্ধসাহিত্য চর্চায় তাঁর ভূমিকা ছিল অপরিমেয়। ভারতবর্ষের প্রথম এই আধুনিক মানুষটির আবির্ভাব ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগে, যার সুমহান ব্যক্তিত্ব, মননশীলতা, কর্মক্ষমতা ও পাণ্ডিত্যকে অনুভব করে একালে অপার বিস্ময়ে ভাবিত হতে হয় এই ভেবে যে, এও কি সম্ভব ছিল একটি মানুষের মধ্যে এত কিছুর সমন্বয়! রেনেসাঁস (Renaissance) বা নবজাগরণ যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভের উপর তার সৌধ নির্মাণ করেছিল, সে গুলির মধ্যে 'মানবতাবাদ, প্রাচীন ঐতিহ্যকে আধুনিক দৃষ্টিতে নবমূল্যায়ন, সমাজসচেতনতা, যুক্তিবাদ প্রধান ও প্রাসঙ্গিক' বিষয়। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন যথার্থভাবে ভারতের নবজাগৃতির প্রাণপুরুষ। তিনিই সম্ভবত প্রথম এই পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করে সত্যধর্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, হিন্দু ধর্মের মূল গ্রন্থের ভাষা শিখে এবং গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করে সেগুলোর মধ্যে থাকা ত্রুটি-বিচ্যুতিকে স্পষ্ট করেছেন এবং সেগুলোর মধ্যে থাকা মানবকল্যাণকর চিন্তাভাবনাকে প্রশংসাও করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানব কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করা, সন্ত বা ধর্মপ্রচারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য নয়। তাঁর এই মানবকল্যাণকারী

সত্যধর্ম এসেছে রেনেসাঁসের আশ্রয়ে। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে রেনেসাঁস প্রথমে এসেছিল ইতালিতে চিত্রশিল্পের হাত ধরে, উনিশ শতকের বাংলায় সেই রানেসাঁস এলো প্রথমে সাহিত্যকে বিশেষ করে গদ্যসাহিত্যকে বাহন করে। উনিশ শতকের বাংলার রেনেসাঁসের প্রধান আশ্রয় ছিল গদ্যভাষা, পরে কবিতা, নাটক, উপন্যাস-ছোটগল্পে --একে একে তার পরিপূর্ণ রূপের প্রকাশ পেতে থাকে। রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হওয়ায় তাঁর প্রধান হাতিয়ার বাংলা গদ্যভাষাকে অবলম্বন করে তিনি সমাজসংস্কারের কাজে অবতীর্ণ হলেন। উনিশ শতকের প্রথম পাদ ছিল তাঁর সমাজ সংস্কারের আওতায়।

বাংলা সাহিত্যে রাজা রামমোহন রায়ের অবদানের কথা আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই আমাদের মধ্যে প্রশ্ন জাগে যে-- রাজা রামমোহন রায় কি সাহিত্যিক ছিলেন, যিনি বাংলা সাহিত্যে অবদান রেখেছেন? এর উত্তর খুব একটা সহজ নয়। এর মধ্যে রয়েছে জটিল কিছু ভাবনা, কারণ-- কাব্য-নাটক, উপন্যাস-ছোটগল্প রচনায় তিনি লেখনী ধারণ করেননি, তাঁর লেখনী আরবি, ফারসি, ইংরেজি, সংস্কৃতভাষা ছাড়া প্রায় ত্রিশটি বাংলা প্রবন্ধগ্রন্থ রচনার স্বাক্ষর রেখেছে। তিনি মোট বত্রিশটি ধ্রুপদী সংগীত রচনা করেছেন, যেগুলি 'ব্রহ্মসংগীত' হিসেবে পরিচিত। সংগীতকে সাহিত্য বলার পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথা রয়েছে, সেদিকে যাচ্ছি না। আসছি রামমোহন রায়ের প্রবন্ধচর্চার ক্ষেত্রে। প্রবন্ধ বা রচনাসন্দর্ভকে এককথায় সাহিত্য বলে মেনে নেবার পক্ষে বেশ কিছু জটিলতা রয়েছে, কারণ সাহিত্য 'মানবহৃদয় ও মানব চরিত্রের' কথা বলে, যাতে থাকবে 'artistic ornaments' এবং একটি বিশ্বজনীন আবেগ। রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'জগতের উপর মনের কারখানা বসিয়াছে এবং মনের উপর বিশ্বমনের কারখানা-- সেই উপেরর তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি।'[১] এই সমস্ত তাত্ত্বিক কথাকে তিনি সরলীকরণ করে জানিয়েছেন -- 'অন্তর হতে আহরি বচন/ আনন্দলোক করি বিরচন,/ গীতরসধারা করি সিঞ্চন/সংসার ধূলিজালে।'[২] অর্থাৎ সাহিত্য হল সেই বিষয়, যাকে বলা যাবে-- 'আমি আমার মনের মাধুরী মিশায়ে/ তোমারে করেছি রচনা-- তুমি আমারি...।'[৩] উল্লেখিত কথাগুলো অনুধাবন করলে রাজা রামমোহন রায়কে সাহিত্যিক বলা যাবে কিনা সে বিষয়ে সংশয় থেকেই যায়। কারণ, রামমোহন রায় প্রবন্ধ রচনা করেছেন, যথার্থভাবে রস-সাহিত্য রচনা করেননি। প্রবন্ধ-নিবন্ধকে বা রচনা-সন্দর্ভকে সাহিত্য হিসেবে গ্রহণ না করার পেছনে রয়েছে কিছু সংস্কার ও সিদ্ধান্ত, এগুলি শিখিয়েছে সাহিত্যকে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভাজিত করে দেখার 'কিছু শর্ত, সংজ্ঞা, নিয়ম, রীতি-নীতি ইত্যাদি', তাই প্রবন্ধকে এই সমস্ত আতশকাচে ফেলে দেখার অবকাশ নেই, কিন্তু যাঁরা এই ভাবনাগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে বসেন তাঁদের উদ্দেশ্যে বলতে হয়-- প্রবন্ধের যুক্তি,শৃঙ্খলা, বিশ্লেষণী শক্তি, পান্ডিত্য আধুনিক উপন্যাস ও ছোটগল্পে যথার্থভাবে কি আত্মপ্রকাশ করছে না? করছে বললে বোধ হয় ভুল করা হবে না। সতীনাথ ভাদুড়ী, দেবেশ রায়, তিলোত্তমা মজুমদার প্রমুখ লেখকদের কোনো কোনো উপন্যাস, ছোটগল্পে আমরা প্রবন্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি প্রতিফলিত হতে দেখি। অপরদিকে সৈয়দ মুস্তাফা আলী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, অমর মিত্র প্রমুখ লেখকদের প্রবন্ধ-নিবন্ধ পড়তে পড়তে আমরা চলে যাই 'গীতরসধারা' সিঞ্চিত 'সংসার ধূলিজাল' বিছানো পথে। তাহলে এগুলোকে আমরা কী বলব? সুতরাং আমরা কিছু তাত্ত্বিক আঁটো-সাঁটো জ্ঞানকে দৃঢ়তার সাথে বেঁধে ফেলেছি বলে সমস্যায় পড়ি। এই জ্ঞান-গম্যিকে একটু শিথিল করে নিলে আর সংশয় থাকে না। তাই বিশুদ্ধ প্রবন্ধকারকে সাহিত্যিক হিসেবে মেনে নিতে আমাদের আপত্তি থাকা উচিত নয়। এক্ষেত্রে প্রবন্ধকে প্রবন্ধসাহিত্য বলতেই হয়। ড.শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, 'গুরুগম্ভীর দার্শনিক তত্ত্বালোচনা, দুর্দান্ত ঐতিহাসিক গবেষণা, রাজনৈতিক মসীযুদ্ধ আর সমাজনৈতিক ঘোঁট, সাহিত্যিক বিতর্ক এবং সমালোচনা, আর গদ্যছন্দে লেখকের আত্মপ্রকাশ, ইহাদের সকলকেই আমরা

'রচনাসাহিত্য'র শ্রীক্ষেত্রে আনিয়া একেবারে এক করিয়া দিয়াছি। মোটের উপর গল্প, উপন্যাস এবং নাটক ব্যতীত গদ্যরীতিতে আর যা কিছু লিখিত হয় তাহাই 'রচনা-সাহিত্য' নামে অভিহিত।'[৪] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলার নব্য লেখকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'যশের জন্য লিখবেন না', 'টাকার জন্য লিখবেন না', এবং বলেছিলেন, 'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখবেন।'[৫] রাজা রামমোহন রায় তাঁর প্রবন্ধগুলির মধ্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন কিনা তা পরে বিচার্য। তবে তিনি প্রবন্ধগুলো লিখেছেন মূলত দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করার জন্য। সুতরাং রামমোহন রায়কে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে একজন গুরুত্বপূর্ণ স্রষ্টা হিসেবে আমাদের মেনে নিতে অসুবিধা আর থাকছে না।

এবার আসতে পারি বাংলা গদ্যচর্চার ইতিহাসের রাজপথে রাজা রামমোহন রায়ের আগমন প্রসঙ্গে। আমরা জানি কবিতার আধারে বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্যযুগ তার নিদর্শন রেখে গেছে। মধ্যযুগে গদ্যচর্চার ক্ষীণ প্রভাব দেখা যায়, তবে এর (চিঠিপত্র, হুকুমনামা, দলিল- দস্তাবেজ প্রভৃতি) উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনিক কাজকে সাফল্য দেওয়া। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র চর্চার বিষয়টি উঠে এসেছে গদ্য ভাষায়। এগুলোতে সাহিত্যের নাম-গন্ধ খুঁজে পাওয়া দুরূহ বিষয়। এই যুগের অন্তিম পর্বে রোমান হরফে বাংলা ভাষায় মুদ্রিত একটি গ্রন্থ পাওয়া যায়, নাম- 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ', প্রকাশকাল ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দ। এমনই প্রকাশ পেয়েছিল 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ'। এরপর হ্যালহেড সাহেবের লেখা ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'A Grammar of the Bengal Language', এরপর এলো আঠারোশো খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ উনিশ শতকের সূচনালগ্ন। ওই বছর জানুয়ারিতে শ্রীরামপুরে ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত হল, এখানে নেতৃত্ব দিলেন উইলিয়াম কেরি সাহেব। উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টধর্ম প্রচার, তাই এখান থেকে বাইবেলের ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্ট অনুবাদ করে প্রকাশ করা হল, গ্রন্থগুলি বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। কর্তৃপক্ষ বুঝলেন ধর্মভজনাকে স্থায়ী রূপ দিতে হলে প্রয়োজন প্রশাসনিক সহযোগিতা, তাই ওই ১৮০০ সালের আগস্ট মাসে লর্ড ওয়েলেসলি প্রতিষ্ঠা করলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। এখানে শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীগণ এদেশীয় ভাষা শিখে এদেশীয় মানুষদের শাসন করবেন। প্রশাসনিক ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করে রাখার জন্য এখানে আনা হল শ্রীরামপুর মিশন থেকে উইলিয়াম কেরি সাহেবকে। তাঁরই নেতৃত্বে রাখা হল খ্যাতনামা পন্ডিত মুন্সীদের যাঁরা সিভিলিয়ানদের পাঠ্যপুস্তক রচনা করবেন। রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, তারিণীচরণ মিত্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়,চণ্ডীচরণ মুন্সী, হরপ্রসাদ রায় প্রমুখ পণ্ডিতগণ ছিলেন একেবারে সামনের সারিতে। কেরি সাহেব এঁদের নেতৃত্ব দিলেন।

রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে। বাংলা গদ্যগ্রন্থ 'বেদান্ত গ্রন্থ' রচনা করে প্রকাশ করলেন ওই বছর। তাঁর শেষ গ্রন্থ 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' প্রকাশ পায় ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে। তিনি প্রায় ত্রিশটি বাংলা গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই রচনাগুলো কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত, যেমন-- শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ, বিতর্কমূলক, মিশনারীদের বিরুদ্ধে রচনা, মৌলিক গ্রন্থ, সহমরণ বিষয়ক রচনা প্রভৃতি। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থগুলি হল 'বেদান্ত গ্রন্থ', 'বেদান্ত সার', 'উপনিষদের অনুবাদ', 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার', 'গোস্বামীর সহিত বিচার', 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক-নিবর্তক সম্বাদ', 'কবিতাকারের সহিত বিচার', 'পথ্যপ্রদান', 'মুণ্ডকোপনিষৎ', 'কেনোপনিষৎ' প্রভৃতি।

বাংলা গদ্যচর্চায় রাজা রামমোহন রায়ের অবস্থান বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম দিয়ে প্রবন্ধ রচনা করলেন, শিরোনামটি হল -- 'বাংলা গদ্যের জনক'। তাঁর এই শিরোনাম রচনার পেছনে যুক্তি ছিল যে, রামমোহন রায়ের আগমনের আগে বাংলা গদ্যরচনা হয়েছে পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা মেটানোর জন্য, আর-- '১৮১৫ সালে রামমোহনের প্রথম বাংলা বই 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশিত হল ।সেই বই পাঠ্যপুস্তক নয়, বাংলায় লেখা একটি মৌলিক গ্রন্থ, উপরন্তু অবোধ সংস্কৃত শব্দের ভারে দুর্বোধ্য নয়। প্রকৃত অর্থেই এটি বাংলা গদ্য।'[৬] তিনি এই কারণে রামমোহন রায়কে 'বাংলা গদ্যের জনক' বলেছেন। আবার বাংলা গদ্যভাষাকে নাকি রামমোহন গ্র্যানাইট পাথরের উপর স্থাপন করেছিলেন-- এ মন্তব্য কেউ কেউ করেছেন। এ কথা ঠিক তাঁর গদ্য গ্র্যানাইট পাথরের উপর স্থাপিত হয়েছে কিনা সেটা বিতর্কে বিষয় হতে পারে, তবে তিনি তাঁর গদ্যভাষাকে একটি ক্লাসিক কাঠামো দান করেছিলেন, নিঃসন্দেহে একথাটি বলতে হয়। বাংলা গদ্যের জনক বলতে আমরা বুঝি --যিনি প্রথম গদ্যভাষাকে রূপদান অর্থাৎ সৃষ্টি করেছিলেন পিতার ভূমিকা নিয়ে, সেদিক থেকে রামমোহন রায়কে 'বাংলা গদ্যের জনক' বলা মুশকিল, কারণ রামমোহনের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে ১৮১৫ সালে আর রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন' লেখা হয়েছে যথাক্রমে ১৮০১ ও ১৮০২ সালে।শুধু এঁরা নন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিত মুন্সীগণ বহু বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা করেছেন রামমোহন রায়ের আগে।

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় রামমোহন রায় সম্পর্কে লিখেছিলেন-- ''দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ সরল ভাষায় লিখিতেন...।'' এই উক্তিটি একেবারে রামমোহন রায় সম্পর্কে উচ্চ-প্রশংসার বটে, কিন্তু আগের গদ্যকারগণ বিশেষ করে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও চণ্ডীচরণ মুন্সীর গদ্য রচনা রামমোহনের থেকে অনেক বেশি সহজ-সরল ছিল--এ বিষয়টি অকপটে স্বীকার করতে হয়। কেউ কেউ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের গদ্যের শিল্পরীতির সাথে বিদ্যাসাগরের গদ্যের শিল্পসুষমার সাদৃশ্যও খুঁজে পেয়েছেন। রামমোহন রায়ের গদ্যকে এই সমস্ত তুল্য-মূল্য চুলচেরা বিচার করে তাঁকে তাঁর পূর্ববর্তী গদ্যকারদের থেকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং বাংলা সাহিত্যে তাঁর সীমাহীন অবদানের কথাকে প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। বাংলা গদ্যরচনার ক্ষেত্রে তিনি যে সমস্ত অবদান রেখেছেন সেগুলি একে একে উল্লেখ করা যেতে পারে।

(ক) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিতবর্গ বাংলা গদ্যচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা মিটিয়ে সিভিলিয়ানদের দ্রুত বাংলাভাষা শিখিয়ে প্রশিক্ষিত করা। রামমোহন রায় সেই মনস্বী-পুরুষ, যিনি প্রথম পাঠ্যসূচির বাইরে গদ্য লিখে বাংলা গদ্যকে সাবলীলতা দানের চেষ্টা করলেন।

(খ) রামমোহন রায় বহু ভাষাজ্ঞ পন্ডিত হয়েও বাংলা ভাষাচর্চার জন্য তাঁর লেখনী ধারণ করেছিলেন বাংলা ভাষার প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই, এতে তাঁর কোন ব্যবসায়িক স্বার্থ ছিল না, কিন্তু এই শ্রদ্ধা বা ভালোবাসা থাকুক বা না-ই থাকুক ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিতেরা লিখতেন বাংলা ভাষায়, এর বিনিময়ে তাঁরা বেতন-ভাতা পেতেন।

(গ) যে সময় বাংলা ভাষার প্রতি সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর খুব একটা আকর্ষণ বা বলা যেতে পারে নির্ভরশীলতা ছিল না, তাঁরা ইংরেজি, ফারসি ভাষার প্রতি অধিকতার মনোযোগী ছিলেন, সেই সময়ে রামমোহন আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপন্ন অর্জন করেও নিজের মাতৃভাষায় গদ্যচর্চা করে

মাতৃভাষাকে সম্মানিত করেছিলেন এবং আঙ্গুল তুলে দেখিয়েছিলেন যে, এই মাতৃভাষা বাংলায় দুরূহ-দার্শনিকতত্ত্ব সমন্বিত উপনিষদের ভাব প্রকাশ করা সম্ভব এবং প্রতিকূল সমাজকে জব্দ করার জন্য আয়ুধ হিসেবে নব-উন্মেষিত বাংলা ভাষাই যথেষ্ট, তাই তিনি নানা বিতর্ক, প্রস্তাব, বিচারমূলক প্রবন্ধ রচনা করলেন বাংলা ভাষাতেই। একথা ভাবলে আমাদের মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে যায়। বিদগ্ধ অধ্যাপক হীরেন চট্টোপাধ্যায় উপরোক্ত ভাবনার সাথে দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করেছেন-- 'বাংলা গদ্যভাষার প্রতি কতখানি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং তার প্রকাশ-ক্ষমতার প্রতি কতখানি বিশ্বাস থাকলে এ কাজ করা সম্ভব! ভবিষ্যতের রামমোহন-চর্চার সময় এই প্রসঙ্গটি গবেষকদের স্মরণ রাখতে অনুরোধ করবো।'[৭]

(ঘ) রামমোহন রায় প্রথম ইংরেজি যতি-চিহ্নকে অনুসরণ করে এবং তা প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলা বাক্যে আনার চেষ্টা করলেন ধ্বনি-ঝংকার ও স্পন্দন। তাঁর আগে এক দাড়ি (।), দুই দাড়ি (।।), ড্যাশ (--), বিন্দু (.) চিহ্ন দিয়ে বাংলা গদ্য রচনা করা হতো, রামমোহন সেখানে তাঁর 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার' গ্রন্থে সংযোজন করলেন কমা (,), সেমিকোলন (;) ও উদ্ধৃতি (' ') চিহ্ন।[৮]

এস্থানে একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করার লোভ সংবরণ করা সম্ভব হল না। দৃষ্টান্তটি হল:
'শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী যে পত্র সাঙ্গবেদপাঠহীন অনেক এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণেরদের নিকটে পাঠাইয়াছেন, তাহাতেই দেখিলাম, যে তেঁহ লিখিয়াছেন, 'বেদাধ্যয়ন হীন ব্যক্তিরদের স্বর্গ এবং মোক্ষ হইতে পারে না, আর যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করিয়াছে, তাহারি কেবল ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার, এবং ব্রাহ্মজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে বেদোক্ত এবং স্মৃত্যুক্ত কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য হয় আর... সুতরাং আমরাও ইহা স্বীকার করি;' (সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার)

(ঙ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার-সহ লেখকেরা যেভাবে দীর্ঘ-সংস্কৃত সংযুক্ত শব্দের সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার করেছেন, রামমোহন সেভাবে এবং সেপথে হাঁটলেও নতুন পথের সন্ধান করে তার আলোকরেখাকে এঁকে গেছেন তাঁর লেখা 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' গ্রন্থে। এই গ্রন্থে খাঁটি বাংলা সমাসবদ্ধ শব্দকে সংকলিত করেছেন, এমনকি তদ্ভব ও দেশি শব্দকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন-- হাড়কাটা, ঘরপাগলি, মুখচোরা,তালপুকুর, বাগ্দিনী, কামারনি, খড়োঘর, গাছপাকা, বানরমুখো--- আরো কত কী![৯]

(চ) রামমোহন রায় প্রথম বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩) লিখেছিলেন, তাঁর পূর্বে উইলিয়াম কেরি ১৮০১ সালে লিখেছিলেন বাংলা ব্যাকরণ ইংরেজি ভাষায়, নাম ছিল 'Grammer of the Bengali Language'। রামমোহন এই গ্রন্থের সীমাবদ্ধতা বুঝেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন বাংলা ভাষার একটি বিশিষ্টতা রয়েছে, এ ভাষাকে অন্যান্য ভাষার সাথে তুলনা করা চলে না, এমনকি এ ভাষায় ব্যাকরণ কখনো অন্য ভাষার ব্যাকরণভিত্তিক বৈশিষ্ট্যে সাযুজ্য রক্ষা করে না, বিষয়টি কেরি সাহেবের ব্যাকরণেও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তাই রামমোহন 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' রচনা করে বুঝিয়ে দিলেন বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য রয়েছে যা অতুলনীয় ও নির্বিকল্প। এছাড়া রামমোহনের 'Brahmanical Magazine' (পরবর্তীকালে 'ব্রাহ্মণ সেবধি' নামে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত) এবং 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১ খ্রিস্টাব্দ) নামের দুটি সাহিত্য পত্রিকা বাংলা গদ্যভাষা চর্চার ইতিহাসে মাইল-ফলক রচনা করেছে।

আলোচ্য প্রবন্ধের এই অন্তিম পর্বে আমরা রাজা রামমোহন রায়ের লেখা কয়েকটি গ্রন্থ থেকে কিছু দৃষ্টান্ত চয়ন করছি, যেগুলো পাঠ করে যৎকিঞ্চিৎ হলেও তাঁকে মূল্যায়ন করার সুযোগ পাওয়া যাবে :

(অ) ‘‘কিরূপে পন্ডিতেরা লৌকিক কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্তে ব্রহ্মস্বরূপে আঘাত করিতে উদ্যত হয়েন অর্থাৎ তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন বিনাশযোগ্য মূর্ত্তিমান্ কহিতে সাহস করেন। ইহা হইতে আশ্চর্য্য আর অন্য কি আছে যে ইন্দ্রিয় হইয়া পর যে মন এবং মন হইতে পর যে বুদ্ধি বুদ্ধি হইতে পর যে পরমাত্মা তাঁহাকে বুদ্ধির অধীন যে মন সেই মনের অধীন যে পঞ্চেন্দ্রিয় তাহার মধ্যে এক ইঙ্গিত যে চক্ষু সেই চক্ষুর গোচরযোগ্য করিয়া কহেন।’’ (ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার)

(আ) **প্রথম প্রবর্ত্তকের প্রশ্ন:** আমি আশ্চর্য জ্ঞান করি যে তোমরা সহমরণ ও অনুমরণ যাহা এদেশে হইয়া আসিতেছে তাহার অন্যথা করিতে প্রয়াস করিতেছ।

নিবর্ত্তকের উত্তর: সর্ব্বশাস্ত্রেতে এবং সর্ব্বজাতিতে নিষিদ্ধ যে আত্মঘাত তাহার অন্যথা করিতে প্রয়াস পাইলে তাঁহারাই আশ্চর্য্য বোধ করিতে পারেন যাঁহাদের শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাই এবং যাঁহারা স্ত্রীলোকের আত্মঘাতে উৎসাহ করিয়া থাকেন। (সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ)

(ই) ‘শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্ম্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন।’ (ব্রাহ্মণ সেবধি)

সুতরাং বাংলা গদ্যসাহিত্যে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান বিষয়ে আলোচনার উপসংহারে একথা অসঙ্কোচে বলা যায় যে, রামমোহন রায় ছিলেন বাংলা গদ্যে স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তি প্রয়োগের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকারী প্রথম স্থপতি। তাঁর ভিত্তিপ্রস্তরের উপর অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত ও কারুকার্যময় সৌধ নির্মাণ করেছিলেন তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরী প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আচার্য সুকুমার সেন যথার্থই বলেছিলেন, ‘তিনি আমাদের দেশের প্রথম লিঙ্গুয়িষ্ট।’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই বিখ্যাত উক্তি তুলে ধরতেই হয় যে-- রাজনীতি, বিদ্যাশিক্ষা, সমাজ, ভাষা, আধুনিক বাংলাদেশে রামমোহন রায় সব কিছুই সূত্রপাত করে গেছেন। বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে বাংলা গদ্যসাহিত্যে তাঁর অবদান বিষয়ে আর কোনও সংশয় থাকে না।

তথ্যসূত্র:

(১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্যের বিচারক,সাহিত্য, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ,১৪১১বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৫৩
(২) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পুরস্কার, সোনার তরী, সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী,পুনর্মুদ্রণ,১৩৯৬ বঙ্গাব্দ,পৃষ্ঠা-১৮৩
(৩) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, মাইতি বুক হাউস, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭২১
(৪) দাশগুপ্ত, শশিভূষণ,বাংলা সাহিত্যের একদিক, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯৩ বঙ্গাব্দ,পৃষ্ঠা- ৯
(৫) চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, বাঙ্গালার নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদন, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, সাহিত্য সংসদ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-২৩৬

(৬) ঠাকুর, সৌম্যেন্দ্রনাথ, রাজা রামমোহন রায়, সাহিত্য আকাদেমি, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১২ ইং, পৃষ্ঠা- ৩৩

(৭) চট্টোপাধ্যায়, হীরেন, সার্ধ-শতবর্ষে রামমোহন রায়, কোরক সংকলন, কোরক, কলকাতা, ২০২২ বঙ্গাব্দ,পৃষ্ঠা- ৪৬

(৮) ঘোষ, জয়দীপ,বাংলা গদ্যের উন্মেষ: প্রাথমিক পর্যায়, প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, প্রথম খন্ড, সত্যবতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার, রত্নাবলী,কলকাতা, পৃষ্ঠা- ১০২৯

(৯) তদেব।

আকরগ্রন্থ:

(১) দুশ বছরের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য, দ্বিতীয় খন্ড--অলোক রায়, পবিত্র সরকার, অভ্র ঘোষ, সাহিত্য আকাদেমি।

(২) প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, প্রথম খন্ড-- সত্যবতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার, রত্নাবলী, কলকাতা।

(৩) রামমোহন রায় নির্বাচিত সংগ্রহ--বারিদবরণ ঘোষ, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, নয়া দিল্লী।

(৪) সার্ধ- শতবর্ষে রামমোহন, কোরক সংকলন, কোরক, কলকাতা।

(৫) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আধুনিক যুগ-- শ্রীমন্ত কুমার জানা, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, কলকাতা।

(৬) বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস--ক্ষেত্রগুপ্ত, গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা।

(৭) সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড--পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জয় দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা।